কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 23 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৬...

ড. হারুন রশীদ

# সংস্কৃতিবিমুখ শিক্ষা নয়



শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রসঙ্গে যে বিষয়টি চলে আসে তা হচ্ছে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টি। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দক্ষ, মেধাবী ও সঠিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করতে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। পে স্কেল বাস্তবায়নের পর এখন অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো নানা রকম বৈষম্য রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন কাঠামো থেকে শুরু করে অন্য প্রায় সব বিষয়েই রয়েছে বৈষম্য। গ্রাম ও শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষার মান এক নয়

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একটি জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া কোনোভাবেই তা সম্ভব নয়। বর্তমান সরকার নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকারের দুটি মেয়াদে শুধু শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তই হয়নি, কোটি কোটি ছাত্রের হাতে ঝকঝকে ছাপানো বই পৌঁছে দিয়েছে সরকার। এবং তা সময়মতো। শুধু তাই নয়, এই সময়ে একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে সরকার। এ শিক্ষানীতির আলোকেই বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই শিক্ষানীতির আলোকেই। পঞ্চম শ্রেণি পাস করেই একজন শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট পাচ্ছে। এটা তার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা রাখছে। এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় বসার আগেই একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে এতে। ছাত্রদের পরীক্ষাভীতি কমছে। পরিবর্তন এসেছে সিলেবাস কারিকুলামে। পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে। শিক্ষায় আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধন, ভর্তিপ্রক্রিয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হচ্ছে এসএমএস কিংবা অনলাইনে। মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ চালু, টেলিভিশনে দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পাঠদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া কোচিংবাণিজ্য বন্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর সবই শিক্ষাব্যবস্থায় একটি পরিবর্তনের ধারা সূচিত করেছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে যে নীতিমালা জারি করা হয়েছে তা সব মহল থেকে প্রশংসিত হয়েছে। এই নীতিমালায় বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক আঘাত, অশালীন মন্তব্য, অশোভন অঙ্গভঙ্গি করতে পারবেন না। মানসিকভাবেও ছাত্রছাত্রীদের কোনো নির্যাতন করা যাবে না। এ নীতিমালা যাতে শতভাগ নিশ্চিত করা যায় সে জন্য শিক্ষক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকতার পেশা মহান। যাঁরা শিক্ষাদানকে ব্রত হিসেবে নিয়েছেন সমাজের চোখে তাঁরা মর্যাদাবান। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাঁরা আদর্শস্থানীয়। শিক্ষকের আচার-আচরণ দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। এ জন্য তাঁদের হতে হয় দায়িত্বশীল। বিশেষ করে ক্লাসরুমে পড়ানোর সময় ছাত্রছাত্রীদের ভুলত্রুটি ধরার চেয়ে তাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার দিকেই জোর দেওয়া উচিত।

একজন স্নেহপ্রবণ শিক্ষক ক্লাসের দুর্বল ছাত্রটির কাছ থেকেও সহজেই পড়া আদায় করতে পারেন। কিংবা দুষ্ট ছাত্রকে বশে আনতে পারেন। জোর করে, ভয়ভীতি দেখিয়ে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করা যায় সেটা ভাবা উচিত। ছাত্রদের পেটানো, বেত মারা, শারীরিকভাবে আহত করা, এগুলো বর্তমান দুনিয়ায় চিন্তাও করা যায় না। শাসন করতে হলে সোহাগ করতে হবে আগে। তবে শাসনের সীমারেখা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজে ভর্তি হয় জ্ঞানার্জনের জন্য। তারা যদি সব জানবেই, তাহলে তো আর বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। ছাত্রছাত্রীদের ভুল হতে পারে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাদের ভুলত্রুটি শোধরানোর দায়িত্ব তো শিক্ষকদেরই। এ জন্যই তো শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর।

আমাদের সমাজে শিক্ষকরা স্নেহময়, হৃদয়বান মহৎপ্রাণের মানুষ। কিন্তু এমন দু-চারজন শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা ছাত্রছাত্রীদের গায়ে হাত তোলেন। গরু-মোষের মতো পেটান। বলার অপেক্ষা রাখে না, এঁদের কারণেই সমাজে শিক্ষকদের বদনাম হয়। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হওয়া উচিত অত্যন্ত মধুর। সেখানে ভয়ভীতির কোনো স্থান নেই। সরকার যে নীতিমালা করেছে তা সবারই মেনে চলা উচিত।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কোচিংবাণিজ্য বন্ধ করতে সরকারের কাছে দাবি জানানো হচ্ছিল। কিন্তু কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এ-সম্পর্কিত রিট আবেদনে অভিযোগ করা হয়, স্কুলের শিক্ষকরা স্কুলের বাইরে কোচিংয়ে ক্লাস নিয়ে বাড়তি টাকা পান বলে স্কুলগুলোয় ঠিকমতো ক্লাস নেন না। কিন্তু সরকার যেহেতু তাঁদের বেতন দেন, স্কুলে ঠিকমতো ক্লাস নেওয়া তাঁদের দায়িত্ব। তাই শিক্ষকদের কোচিংয়ে ক্লাস নেওয়া বন্ধ করার লক্ষ্যে এ আবেদন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এ কোচিংবাণিজ্য বন্ধ করা জরুরি।

কোচিংবাণিজ্য বন্ধ করতে সরকারের নীতিমালায় বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক ক্লাসের বাইরে নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোচিং দিতে পারবেন না। তবে অন্য বিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। এও বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষার্থী পড়াশোনায় দুর্বল, তারা ক্লাসের নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে নির্ধারিত ফির বিনিময়ে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে পড়তে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এটা কতটা বাস্তবসম্মত এবং এর তদারকিই বা করবে কে? এভাবে কি কোচিং বন্ধ করা যাবে?

সত্যি বলতে কি শিক্ষাঙ্গনে কোচিংব্যবস্থা এক মারাত্মক ব্যাধির রূপ নিয়েছে। এর বিস্তার ঘটেছে বিপুলভাবে। বেশি উপার্জনের জন্য এক শ্রেণির শিক্ষক কোচিংয়ে তাঁর শক্তি ও সময় ব্যয় করছেন। ফলে উপেক্ষিত হচ্ছে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাদান। আবার এর অন্য একটি অনৈতিক দিকও রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও এক ধরনের চাপ অনুভব করেন শ্রেণিকক্ষের শিক্ষকের কাছে কোচিং করাতে। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে এটা অনৈতিক কৌশল হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক সমাজে সাধারণভাবে পরীক্ষায় ভালো ফল লাভের আশায় শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে। শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পাঠদান করা গেলে, মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে একজন শিক্ষার্থীর কোচিংয়ে পড়ার দরকার হতো না।

শিক্ষক ও ছাত্রের একটি বাস্তবসম্মত অনুপাত রক্ষা করাও জরুরি। সুতরাং শিক্ষার উন্নতির জন্য পুরো বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈষম্য, অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে কোচিংব্যবসা ও শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করতেই হবে। শিক্ষাকে কিছুসংখ্যক লোকের অনৈতিক বাণিজ্যের ধারা থেকে বের করে আনতে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে শিক্ষকদের পূর্ণ প্রস্তুতি ও মনোযোগ দিতে হবে। বিশ্বের কোথাও মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এ ধরনের কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনির রমরমা ব্যবসা নেই। বর্তমান বাস্তবতায় কোচিংব্যবসা বন্ধের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার মানোন্নয়নে দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রসঙ্গে যে বিষয়টি চলে আসে, তা হচ্ছে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টি। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দক্ষ, মেধাবী ও সঠিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করতে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। পে স্কেল বাস্তবায়নের পর এখন অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো নানা রকম বৈষম্য রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন কাঠামো থেকে শুরু করে অন্য প্রায় সব বিষয়েই রয়েছে বৈষম্য। গ্রাম ও শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষার মান এক নয়। রয়েছে নানা মাধ্যম ও ধরনের (মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম, ক্যাডেট স্কুল ও কলেজ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে একটি সমতা নিয়ে আসতে হবে, যাতে একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখা যায়।

এ ছাড়া বর্তমানে জঙ্গিবাদের চরম উত্থানের সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। পাঠ্যসূচিতে এমন বিষয় নিয়ে আসতে হবে, যাতে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার থেকে দূরে থাকতে পারে শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতিচর্চা বাড়াতে হবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঠিক ইতিহাস থেকে পাঠ নিতে হবে, যাতে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি শিক্ষার্থীদের দায়বোধ সৃষ্টি হয়। প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই যুগে শিক্ষার্থীরা আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে গড়ে উঠুক—আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হোক সেই দিকে। মনে রাখা প্রয়োজন, এ ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকাই কিন্তু মুখ্য।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট
harun_press@yahoo.com